"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৭তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জাল : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

https://www.parthasarathipatrika.com

৭৬ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ / 24.07.2026

-ঃ সম্পাদক ঃ-

সুনন্দন ঘোষ

- সূচিপত্র -

(৭৬ তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
আত্ম-কথা	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
আধ্যাত্মিকতা-বাস্তবতা	শ্রীঅরবিন্দ
সুভাষচন্দ্রের জীবনে আধ্যাত্মিক ধারা	শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী
উপনিষদের মর্মবাণী	শ্রীমতী নমিতা রায়চৌধুরী
আগরতলায় আরেকবার	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
পিতা-মাতার স্নেহ	বাণীপ্রভা
সুমিতের জন্য	সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

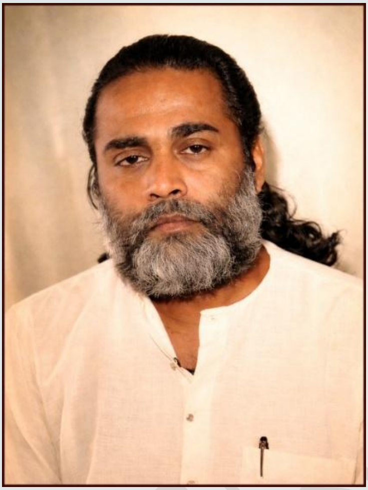

[১০.০৩.১৯২৬ – ২৪.১১.১৯৮৬]

প্রীতি-কণা

"মানুষের মনে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা এবং ভাবাবেগ বা অনুরাগ বর্তমান। যে কারণেই কারো জ্ঞানে প্রবল আগ্রহ, কারো কর্মের ইচ্ছা প্রবল, কেউ বা অনুরাগ বা ভক্তিরসে আপ্লুত। গীতা এই তিনটি গুণেরই সমন্বয়ের সমার্থক। প্রকৃত জ্ঞানীই প্রকৃষ্ট কর্মী। পক্ষান্তরে, শ্রদ্ধা ছাড়া জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। কর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞান অনভিপ্রেত। অপরপক্ষে, ভক্তিশূন্য জ্ঞান আবার অহংবোধের সৃষ্টি করে। অহংবোধ কর্মের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলে কর্তৃত্বাভিমান আর অনাসক্ত কর্মের পথে বিঘ্ন ঘটায়। ভক্তি থেকেই শ্রদ্ধা যেমন জাগ্রত হয়, তেমন অহং দূর হয় আর সেই সাথে ত্যাগের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।"

এবার পূজার ছুটিতে আমরা বম্বে ও সোমনাথ ও দ্বারকা ঘুরে এলাম। একাদশীর দিন এখান থেকে বম্বে মেলে রওনা হলাম। আমাদের দুটি আপার বার্থ ও একটি মিডল বার্থ পাওয়া গেছিল। একটি ফ্যামিলি বম্বে পুনা বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তাঁরা একটি লোয়ার বার্থ ছেড়ে দেওয়াতে সোমা বাচেন্দ্রীকে নিয়ে রাত কাটায় নিরাপদে। আমি আপার বার্থে গেলাম। এবার বুঝলাম বয়স হয়েছে। অত উপরে উঠতে গিয়ে প্রায় হাত ফসকে যায় আর কি! অথচ গত ১৯৯২-তে লক্ষ্ণৌ থেকে আপার বার্থে এসেছিলাম। কোনও সমস্যাই হয়নি। এবার দেখলাম বেশ অসুবিধাই হোল। রাত তো কাটলো। সকালে মোটামুটি ভালোই কাটছিল। বাইরের লোক বেশী ছিল না। বিভ্রাট হোল দুপুরে খাবার আগে বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গিয়ে। ট্রেনটা স্পিডে চলছিলো। হঠাৎ ব্রেক করলো। আমি সামলাতে না পেরে ধপাস্। দরজাটা খোলা ছিল। আমার ওঠার ক্ষমতা ছিল না। দেখলাম দরজা দিয়ে বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলা মুখ বাড়াচ্ছেন। তাঁরা কেউ এগিয়ে না আসাতে আমিই সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার তখন গেয়ে ওঠবার কথা- "আমার এই দেহখানি তুলে ধর" - কিন্তু আমার চেহারা দেখে কেউ সে সাহস পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত দুটি 'হাফু' মার্কা ছেলে আমায় টেনে তুললো। নিজের জায়গায় আসবার পর বাপী ও সোমা ভালোভাবেই First aid দিল। Medi cream লাগানো হোল। কিন্তু আমার Heap Joint এ যে কি যন্ত্রণা হচ্ছিলো তা বলবার নয়। আমি রীতিমত শব্দ করে কান্না শুরু করেছিলাম, সেটা ব্যথার জন্য নয় - toilet-এর ময়লা শাড়ীতে লেপে যাবার জন্য। ভীষণ ঘেন্না করছিল। যাইহোক, রাতটাতো কাটলো। নাসিকের পর train late হোল। থানে ষ্টেশন পেরোলাম যেই, অমনি গাড়ী থেমে গেল। বম্বের

নিয়ম হোল আগে local train-গুলি pass করিয়ে দেওয়া। ও বাবাঃ ! বসে আছি তো বসেই আছি। অনেক লোক নেমে গেলেন 'থানে' থেকে লোকাল ট্রেন ধরে বম্বে V. T. যাবেন বলে। আমরা জিনিষপত্র ও বাচ্চা থাকবার জন্য নামতে ভরসা করলাম না। প্রায় চারঘন্টা কাটলো ঐ ভাবে। ওদিকে দাদারে পঙ্কজ ও Bombay V.T.-তে পুষ্পাদি অপেক্ষা করছেন। ওদের কথা মনে করে আমাদের আরও খারাপ লাগছিলো।

শেষ পর্যন্ত বম্বে পৌঁছালাম। পঙ্কজ সেদিনই আমাদের দহিসরে ওদের বাড়ী নিয়ে যাবে ঠিক করেছিলো। আমার আর জায়গা বদল করবার ইচ্ছে হয়নি। ঠিক হোল পরদিন পঙ্কজ বিকাল সাড়ে ৪টার মধ্যে এসে নিয়ে যাবে।

২৮শে অক্টোবর রাত ১২টার সময় পুষ্পাদির ছেলে সাহেব হঠাৎ গাড়ীর ব্যবস্থা করল রাত্রে Marine drive দেখতে যাবার জন্য। বম্বেতে রাত্রে যাতায়াত করাটা কোনও ব্যাপার নয়। দেখলাম সেখানে রাত একটার সময় দলে দলে লোক কুলফি বা ফুচকা খাচ্ছে। রাস্তাঘাট আলোয় আলো। আমাদেরও খুব ভালো লাগলো।

পরদিন আবার সকালে আমরা sightseeing-এ বেরোলাম। মহালক্ষীর মন্দির, হাজিআলি, ক্রফোর্ড মার্কেট, তারাপোরেওয়ালা এ্যাকুরিয়াম, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া ইত্যাদি ঘুরে দেখলাম, পঙ্কজ আসবে বলে ২টার মধ্যে বাড়ী চলে এলাম। এদিকে দুমিনিট বাদ বাদ মিঠু ফোন করছে। অস্থির হয়ে উঠেছে। পঙ্কজ এদিকে জ্যেঠিমাকে নিয়ে যাবে বলে একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করেছে। সেই গাড়ী নিয়ে সে এলো রাত সাড়ে আটটায়। আমার তো তখন মেজাজ বিগড়োচ্ছিল। Zoo Garden দেখা হোল না। রওনা হলাম, পরদিন ফিরে আসব। রওনা হয়ে কিছুটা যাবার পর

হঠাৎ দেখি গাড়ী আর চলছে না, ধাক্কা মারতে হচ্ছে। বাপী পঙ্কজ নেমে ধাক্কা লাগালো; আমার ভিতরে ভিতরে একটা বিরক্তি দানা বাঁধছিলো। বম্বেতে Local train-এর frequency চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। train-এ আমরা কি আরামে যেতে পারতাম! যাইহোক রাত ঠিক সাড়ে দশটায় যখন মিঠুর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আমার ঘুমের অর্দ্ধেক পূর্ণ করে ফেলেছি। ঐ মধ্যরাত্রে মিঠুর যত্ন সুরু হোল। রাত্রে আমরা স্নান করলাম। ওখানে তো ঠাণ্ডা একেবারেই নেই। মিঠু কত যত্ন করে কতরকম রান্না করে রেখেছিল। মিঠুর সংসারী চালচলন দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। সবচেয়ে ভালো লাগলো ওর চিকেন স্যুপ ও দইবড়া। বেশ গুছিয়ে সংসার করছে। ৩০শে অক্টোবর পঙ্কজ আমাদের নাসিক ও শিরডি যাবার ব্যবস্থা করেছিল। পরদিন আমরা সোমনাথ রওনা হব, তাই অতদূর Journey করতে আর ভরসা করলাম না। তাছাড়া পঙ্কজের গাড়ী ও তার ধাক্কাধাক্কি মনে করে আমার যাবার ইচ্ছে চলে গেছিলো। তবু পঙ্কজ আমাদের বোরিভিলি ন্যাশনাল পার্ক, কানহেরি কেভস, জুহুবীচ ইত্যাদি দেখিয়ে দিলো। মিঠু সান্তাক্রুজ মার্কেট থেকে আমার জন্য বিশাল মাপের দুটি ম্যাক্সি কিনে ফেললো। তারপর রাত্রে আমরা আবার পুষ্পাদির কাছে বম্বে সেন্ট্রালে ফিরে এলাম।

পরদিন ৩১শে অক্টোবর, '৯৩ আমরা সৌরাষ্ট্র মেলে সোমনাথ রওনা হলাম। পুষ্পাদিও আমাদের সঙ্গ নিলেন। আমরাও সঙ্গী পেয়ে খুশী হলাম। একই কামরায় পুষ্পাদির Reservation-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ আমরা রাজকোট নামলাম। Platform-এর উল্টো দিকে ভেরাবল এক্সপ্রেস দাঁড়িয়েছিলো। ট্রেন বদল করতে বাচেন্দ্রীকে নিয়ে আমাদের কোনও অসুবিধা হয়নি। সারা ট্রেনে কোনও খাবারের ব্যবস্থা ছিল না, তবে আমাদের কাছে মিষ্টি ইত্যাদি

অনেক খাবার ছিল। যাইহোক বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় ভেরাবলে পৌঁছালাম। সেখান থেকে সোমনাথের মন্দির আট কিলোমিটার। একটা auto-তে আমাদের জায়গা হয়ে গেল।

আমাদের আগে থেকে কোনও চিঠিপত্র ছিল না। তাহলেও সোমনাথ মন্দির ট্রাষ্টের অতিথিশালায় দুটি ঘর পেয়ে গেলাম। বাপী দৌড়ে চলে গেল ছবি তুলতে। আমরা সোমনাথের মন্দির দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কি বিশালতা, কি কারুকার্যময়! সমুদ্রের ধারে যেন নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এত সুন্দর, চিন্তা করা যায় না। বুঝলাম বারবার কেন এমন স্থানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়েছে। আসল মন্দির সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবু মনে হোল এই বা আসল নয় কেন?

একটা জিনিস দেখে খুব ভালো লাগলো। এখানে পাণ্ডাদের কোনও চাহিদা নেই। হাতে করে কেউ টাকা পয়সা নেন না। সবই প্রণামীর বাক্সতে জমা পড়ে। অফিস আছে বিশেষ বিশেষ পূজা দেবার জন্য। আমি সবচেয়ে আগে কিশোরের জন্য পূজা দিলাম, পরে সবার জন্য পূজা দিলাম। আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি এটি আসল সোমনাথের মন্দির নয়। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একজন তো এই সোমনাথই। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলাম।

১লা নভেম্বর সোমনাথে রাত কাটলো। ২রা নভেম্বর Sightseeing-এ বেরোলাম। প্রভাসতীর্থে এসে আবার তীর্থের বারি সংগ্রহ করলাম। বিভিন্ন মঠ মন্দির দেখলাম। শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম সংস্কারের স্থান দেখলাম। সবচেয়ে মজা হোল ভালুকাতীর্থে গিয়ে। দেখলাম একটি জীবিত বটগাছের নীচেই শ্রীকৃষ্ণ ও হন্তারক ব্যাধের মূর্তি। কথিত আছে ঐ বৃক্ষে আসীন শ্রীকৃষ্ণকে শরাঘাত করা হয়। ঐ একটি

গাছের পাতা সংগ্রহ করবার খুব চেষ্টা করেছিলাম। একজন পুরোহিতকে খুব সাধাসাধি করাতে সে একটি পাতা আমার হাতে দিল। আমার কি আনন্দ। মনে হল হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছি। ওমা সোমনাথে অতিথিশালায় ফিরে এসে দেখি ছেলেটি আমাকে একটি অশ্বত্থ পাতা দিয়েছে। অথচ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির উপর বটগাছ দেখেছি। নিজের উপর রাগ হোল নেবার সময় কেন দেখে নিলাম না।

তারপর আমরা সোমনাথে কিছু কেনাকাটা করলাম। বাচেন্দ্রীর ২টি জামা, সোমার এক সেট সালোয়ার কামিজ, যাতে ওর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল, এবং শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্য এ্যাপ্লিক কাজ করা একটি বেড কভার। তখন কি যে ভাল লেগেছিলো! অথচ ঁকালী পূজার দিন সেটি শ্রীপ্রীতিকুমারের বিছানায় পাতবার পর আমার মনে হল আমি যেন একটি কফিন-ঢাকা নিয়ে এসেছি। আসলে কালো কাপড়ের উপর কাজ করা ছাড়া আর কোনও ভালো চাদর ছিল না। শ্রীপ্রীতিকুমার কালো চাদর একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। সুমিতা একবার একটি সুন্দর কালো সাদা বিছানার চাদর ওঁকে দিয়েছিলো। কিছুতেই সেই চাদরটি পেতে শুতেন না। আমি শেষ পর্যন্ত চাদরটি NCC Camp-এ নিয়ে যেতাম।

এরপর আমরা দ্বারকার উদ্দেশ্যে রওনা হোলাম। রওনা হবার জন্য প্যাকিং শেষ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। মনে হোল ওরা আমাদেরই কলেজের ছেলেমেয়ে। পরে দেখলাম কেয়া, কল্পনা ও শ্রীচিন্ময় শেখর সরকারকে। বিদেশে যেন আপন জনেদের সঙ্গে নূতন করে দেখা হোল। আমি জানতাম আমাদের কলেজের জ্যুলজিকাল এক্সকারসান সোমনাথ দ্বারকাতে হবে। ওখানে দেখা হয়ে যাওয়াতে খুব ভালো লাগলো।

আমরা দ্বারকার দিকে রওনা হলাম বাসে। দ্বারকাতে পৌঁছেছিলাম রাত ১০টায়।

তখন কি আর জানি ওখানে আমাদের মতো খাবার পাওয়া যায় না। সে যে কি কষ্ট, কি কষ্ট! দ্বারকার কথায় পরে আসছি।

(** রচনাকাল – জানুয়ারী, ১৯৯৪)

আধ্যাত্মিকতা-বাস্তবতা **শ্রীঅরবিন্দ**

ভারতবর্ষে পৌঁছবার সময় থেকেই আমার নিজস্ব জীবন এবং আমার যোগ সাধনা সর্বদাই এই জগৎ এবং পর জগৎ নিয়ে। কোন একটি জগৎকেই আমি একান্তভাবে প্রাধান্য দিই নাই। মানুষের সব কিছু আকর্ষণই জাগতিক বিষয়ে আবদ্ধ। আমার মনোজগতে সে সবই প্রবেশ করেছে। রাজনীতিও আমার জীবনে স্থান পেয়েছে। বম্বের অ্যাপোলো বন্দরে নেমে ভারতের মাটিতে যখন পদার্পণ করলাম তখনই আমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আরম্ভ হলো। ঐ সব আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে বাস্তব জগৎ বর্জিত হয় নাই, পরন্তু এই জগতের উপর তাদের আন্তরিক এবং অনন্ত প্রভাব আছে। আমার অনুভূতি হলো অনন্ত ভগবানের যিনি বাস্তব জগৎকে আবৃত করে আছেন এবং একই সময়ে আমি উপলব্ধি করলাম সেই পরমেশ্বরকে যিনি জড় পদার্থের মধ্যে এবং জড় দেহে বাস করছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমি প্রবেশ করলাম বাস্তবাতীত জগৎ সমূহের মধ্যে যাদের প্রভাব কাজ করছে বাস্তব স্তরে, সুতরাং আমি কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে পারলাম না, কোন প্রভেদ করতে পারলাম না

অস্তিত্বের এই দুইটি জগতের মধ্যে বা তাদের মধ্যবর্তী স্থানের। আমার দৃষ্টিতে সব কিছুই ব্রহ্ম, ভগবানকেই আমি দেখি সর্বত্র। প্রত্যেক সাধকেরই অধিকার আছে এই জগৎকে বর্জন করে অন্য জগৎকে গ্রহণ করার। যদি ঐ পথে সে তার অভীষ্ট শান্তি লাভ করে তাহলে সে সৌভাগ্যবান। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোন প্রয়োজনই বোধ করি নাই শান্তি লাভের জন্য এই জগৎকে ত্যাগ করবার। আমার যোগ পদ্ধতিতে আমি আধ্যাত্মিক এবং বাস্তব এই দুই জগৎকেই গ্রহণ করেছি সাধনার ক্ষেত্ররূপে। দিব্য চেতনা এবং দিব্য শক্তিকে মানুষের হৃদয়ে এবং পার্থিব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার যোগ সাধনার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত মুক্তিই আমার উদ্দেশ্য নয়, এই জগতে দিব্য জীবন স্থাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য। ইহাও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। দিব্য জীবন যদি পার্থিব বস্তু এবং পার্থিব উদ্দেশ্য অনুসরণ করে তাহলে তাতে আধ্যাত্মিকতা অথবা ভারতীয়তার কোন অপলাপ হতে পারে না। আমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকেই সত্য সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক, জাগতিক বস্তু সমূহ ও ভগবান সম্বন্ধে আমি এই মতবাদ পোষণ করে এসেছি। সত্যের সমগ্রতাকে গ্রহণ করা এবং তাহার অনুসরণ করাই পূর্ণ যোগ। এই ধরনের সমগ্রতা যে কোন ব্যক্তিই অবিশ্বাস করতে পারে এবং আমার মতকে বর্জন করে অন্য জগতের সত্যকেই একমাত্র সত্য-রূপে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তি আমার যোগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে অক্ষম হবে। আমার যোগ সাধনায় অন্য জগতের অভিজ্ঞতাকে বর্জন করা হয় নাই। পরমেশ্বরের ধাম, অন্যান্য অপার্থিব স্তর এবং অন্তর্বর্তী স্তর সমূহও আমার যোগে সংশ্লিষ্ট। ঐ সমস্ত স্তরের প্রভাব যে আমাদের জড় জগতের জীবনে পতিত হয় তাহাও আমার যোগে স্বীকৃত হয়েছে। ইহা খুবই সম্ভব যে সাধক প্রথমতঃ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপলব্ধিতেই একাগ্র চিত্ত হবে, অথবা ভগবানের শুধু একটি রূপেরই অনুসরণ করবে; শিব বা কৃষ্ণকে এই বিশ্বের এবং আমাদের জীবন ও কর্মের প্রভু রূপে

আরাধনা করবে আর এই যোগের প্রধান ফলগুলি আহরণ করবে অথবা বিশ্বগত সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করার সাধনা করবে এবং তারপর অগ্রসর হবে সমগ্র সত্যের অভিমুখে যদি দিব্য জীবন লাভ করাই তাহার সাধনার লক্ষ্য হয় এবং এই জগৎকে পরমাত্মার জন্য জয় করাই তার যোগ সাধনার উদ্দেশ্য হয়। আমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, জড় বস্তু সম্বন্ধে আমার যোগলব্ধ জ্ঞান এবং পার্থিব জীবনে সত্যতাই আমাকে 'দিব্য জীবন' এবং "সাবিত্রী" লিখতে সক্ষম করেছে। পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বরের উপলব্ধি নিশ্চয়ই অত্যাবশ্যক, কিন্তু তাঁর কাছে যেতে হবে প্রেম, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি নিয়ে; জাগতিক কর্মের মাধ্যমে তাঁরই সেবা করতে হবে; শুধু বুদ্ধি প্রসূত জ্ঞান দিয়েই নয়, পরন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দিয়ে - ইহাও পূর্ণ যোগের পথে মূল প্রয়োজন।

'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে'

"মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। নতুবা মুখে বলিতেছে তুমি আমার সর্বস্ব এবং মন বিষয়কেই সর্বস্ব জানিয়া বসিয়া রহিয়াছে, এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

দেশমাতৃকার পূজারী সুভাষচন্দ্র দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের নিমিত্ত উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর সমগ্র জীবন।

সুভাষচন্দ্রই প্রথম 'সৈনিক' যিনি ভারতভূমিতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁর জীবনালেখ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা পাই তাঁর দুর্জয় ও দুর্দ্দমনীয় সংকল্পের, অপরিসীম শৌর্য্য ও বীর্য্যের কাহিনী। আর পাই তাঁর ওজস্বিতা, সহনশীলতা ও অন্যায়দ্রোহিতার বৃত্তান্ত।

কিরূপে এই শৌর্য্য ও বীর্য্যের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি, ওজস্বিতা, সহনশীলতা ও অন্যায়দ্রোহিতা হয়েছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ, কোথায় ছিল তাঁর দুর্জয় ও দুর্দ্দমনীয় সংকল্পের উৎস, তাহা তাঁর জীবনবেদে স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ না থাকলেও ছড়ানো রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন রচনায়।

"প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের জীবনের ধারা ছিল জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলিত ধারা - বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ জীবনে বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতা এবং তাঁর অনুগ্রহে ঋদ্ধি, বুদ্ধি, সুখশান্তি ও অমৃতত্ব লাভ।"

মৈত্রী সাধনা ছিল তাঁদের জীবনের মহানব্রত। তাঁরা প্রার্থনা করতেন, "আমরা যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দর্শন করি, আমরা যেন পরস্পরকে মিত্রভাবে দর্শন করি।"

আর্য্য ঋষিগণের জীবনধারা সুভাষচন্দ্রকে দিয়েছিল অপূর্ব্ব প্রেরণা। তাঁদের প্রার্থনাবাণী আকৃষ্ট করেছিল সুভাষচন্দ্রকে "পরম্ পবিত্রম্" মহানের দিকে। তিনি

আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর শৌর্য্য, বল, বীর্য্য ও ওজস্বিতা, দুর্দ্দমণীয় সংকল্প এই সর্ববিধ শক্তির মূলে আছেন "তিনি" যিনি জগন্মন্দিরে জগদীশ্বররূপে ও হৃদয়-মন্দিরে হৃদয়বল্লভরূপে চির বিরাজিত।

এইরূপ মহানভাবে বিভাবিত হয়ে মহান নেতা "নেতাজী" তাঁর কর্তব্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি ছিলেন পরম শক্তিমান পরমেশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। আর এই নির্ভরশীলতাই তাঁকে করেছিল সাফল্যমণ্ডিত।

ব্যবহারিক জীবনের অগ্রগতি আত্মিক জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত আর্য্য ঋষিগণের এই প্রত্যক্ষানুভূতি সুভাষচন্দ্রকে ভগবৎ উন্মুখী করেছিল।

যদিও তিনি ছিলেন দেশমাতৃকার পূজারী "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা" সেই দেবীকে, সেই বিশ্বাত্মিকাকে তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন ও জীবনে চলার পথ তাঁহার স্মৃতি দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যতক্ষণ না চিরন্তনী আদ্যা শক্তির তুষ্টি সাধন হচ্ছে ততদিন "উৎপাতপাক-জনিতাংশ্চ মহোপসর্গানের" কবল হতে নিস্তার নেই।

"বিরাটের" সংস্পর্শে না এলে "বিরাট" হওয়া যায় না, ইহাও ছিল তাঁহার আর একটি উপলব্ধি। তিনি জানতেন "জীবনের চরম লক্ষ্য ও কর্তব্যের সমাধান না হলে জাগতিক কোনও বিষয়ে নিখুঁত সমাধান সম্ভবপর নহে।"

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ত্যাগই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, ভোগে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয় না। তাই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন, এমন কি আই. সি. এস. এর লোভনীয়

পদমর্য্যাদাও। যিনি "সর্ব্বংমম দেবদেব" তাঁকে আশ্রয় করে নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিজ কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর হন।

ইহা অনস্বীকার্য্য বিবেকানন্দের বাণী দেশমাতৃকাকে ব্রিটিশের শাসনাধীন থেকে মুক্ত করবার নিমিত্ত সুভাষচন্দ্রকে অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা দিয়েছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনবেদ আলোচনা করলে, ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে, সুভাষচন্দ্রের স্বামিজীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভ, নিজেকে ভগবনুখী করা, আত্মনিষ্ঠ হওয়া।

সুভাষ তাঁহার নিজ কক্ষে স্বামিজীর একখানি জীবন্ত আলেখ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় মানসোপচারে স্বামিজীর অর্চ্চনা করতেন ও স্বামিজীর ন্যায় উদাত্তস্বরে, উপনিষদের মহামন্ত্র-

“শিবোহহং শুদ্ধোহহং নিরঞ্জনোঽহং।
নির্বিকারোঽহং, সচ্চিদানন্দস্বরূপোঽহং।।”

পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতেন ও “সোঽহং” “সোঽহং” “তত্ত্বমসি” -- “আমিই সেই” “আমিই সেই” “আমিই তুমি” জপ করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়তেন। সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন সর্ব্বভূত পরমাত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তি। তাঁহার নিকট উচ্চ-নীচ সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। জাতি বৈষম্যকে সুভাষচন্দ্র ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। পরিব্রাজকরূপে তিনি যখন হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অধিকাংশ তীর্থ পর্যটন করেন তখন সেই সব তীর্থে জাতির ও উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ দর্শনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি তাঁর সহকর্মীগণকে আপন করে নিয়ে একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন পরস্পর মৈত্রী-ভাবাপন্ন।

পরমাত্মাভিমুখী না হলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে একই পতাকাতলে সমবেত করা সম্ভবপর হত না।

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন "ভারত যে ইতিহাসের এত অভিঘাত ও আক্রমণ সত্ত্বেও ভাগ্যবিপর্যয়ে একেবারে তলিয়ে যায়নি, তার কারণ ভারতবর্ষে হিমালয়ের ক্রোড়ে কত মহাপুরুষ অহর্নিশি ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন। তাঁহাদের চিন্তার কল্যাণীশক্তি ভারতকে অলক্ষ্যে রক্ষা করছে।" ভগবন্মুখী ছিলেন বলেই এই উক্তি তাঁহার মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছিল।

মান্দালয়ে কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকাকালীন সুভাষচন্দ্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সেই সময় তিনি কারাগার হতে যে পত্র লিখেছিলেন তাহাতে বলেছিলেন, "I am slowly proceeding towards sepulchre." আমি ধীরে ধীরে সমাধিক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছি এবং আমার এই ব্যাধি হতে নিরাময় হবার একমাত্র উপায় "যোগসাধনা"। সেই সময় হতে তিনি যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

জীবনের পরম প্রস্তুতির পথে সুভাষচন্দ্রের জনক জননীর ও তাঁহার শিক্ষাগুরুর অবদান ছিল অসামান্য। আধ্যাত্মিক জগৎকে সুভাষচন্দ্র কোনও দিন বিস্মৃত হন নি। আধ্যাত্মিক জগৎকে সম্মুখে রেখে স্বীয় কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়েছিলেন তিনি।

হিন্দুধর্ম বেদমূলক। ধর্মের তিনটি ভাগ, তত্ত্বজ্ঞান, উপাসনা ও নীতি। হিন্দুধর্মের প্রথম ভাগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান আবার পৃথক তিনটি অবস্থায় বুঝিতে হয়। (১) বৈদিক (২) দার্শনিক (৩) পৌরাণিক। এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। দেবতাতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ বেদের "সংহিতায়" অর্থাৎ বেদের মন্ত্রসমূহ যেখানে সংহিত বা সংগৃহীত হইয়াছে সেই অংশে ব্যাখ্যাত। আত্মতত্ত্ব উপনিষদে এবং ঈশ্বরতত্ত্ব সংহিতায় এবং উপনিষদে উভয় ভাগেই বিবৃত।

ধর্মের প্রথম অবস্থা জড় প্রশংসা --- শক্তিমান, সুন্দর, উপকারী অথবা অনিষ্টকারী জড় পদার্থের প্রশংসা, স্তুতি ও আদর। মধ্যকালে চৈতন্যবাদ এবং সর্বশেষ পরিণতি একেশ্বরবাদে। বৈদিক ধর্মের চরম অবস্থা উপনিষদে। কেবলমাত্র আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্য স্বরূপ বিরাজমান। জড়ের শক্তির চিন্তার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জড়ের উপাসনা হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য নহে - "নির্গুণ ব্রহ্মেরই স্বরূপজ্ঞান" - ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম।

একই চৈতন্য সকল জীবে বিরাজিত। সেই অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা। তিনিই সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। এই সর্বনিয়ন্তা ঈশা ইষ্ট - সর্বব্যাপী।

ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ধর্মজ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান - ব্রহ্মজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জীবের মুক্তি লাভ হয় না। সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদ। স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেছেন, "যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায় তাহাই উপনিষদ।"

ব্রহ্মবিদ্যা "বুদ্ধিলভ্য" নহে। ইহা "বোধিলভ্য" অর্থাৎ ইহা Intellect গ্রাহ্য নহে, ইহা Intuition গ্রাহ্য।

বেদের অর্থজ্ঞান - বেদের ব্রহ্মপ্রতিবাদক অংশের নাম উপনিষদ। বেদের সার অংশ অর্থাৎ বেদের শেষাংশে যে পরম ব্রহ্ম ও আত্মার একাত্ম-বোধক উক্তি সমূহ আছে তাহাই উপনিষদ। বেদান্ত-ব্রহ্মবিদ্যার সার সঙ্কলনে উপনিষদ। গুরুর নিকট শুনিয়া শুনিয়া এই বিদ্যা প্রবাহিত ছিল এজন্য ইহাকে "শ্রুতি" ও বলা হয়। এই উপনিষদই ১০৮ খানি। তন্মধ্যে ১২টি উপনিষদের ভাবধারাই প্রায়শঃ অন্যান্য উপনিষদে অভিব্যক্ত। নতুন কোনও ভাবধারা অন্যান্য উপনিষদে পাওয়া যায় না ইহাই সুধীজনের অভিমত। উপনিষদের ধর্ম সার্বজনীন, সার্বভৌমিক, সার্বকালিক এবং সার্বজাতিক। ঐ ১২টি উপনিষদ্ যথা-ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরিয়, ঐতেরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও মৈত্রায়ণী। ঈশ উপনিষদ্ ভাবগৌরবে সর্বোৎকৃষ্ট। ঈশ উপনিষদ্ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতার শেষ অধ্যায়।

এইজন্য ইহাকে বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বলা হয়। ঈশ শব্দ এই উপনিষদের প্রথম শব্দ। সেই জন্য ইহা ঈশোপনিষৎ নামে আখ্যাত। অন্যান্য সকল উপনিষৎই বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অংশ। কেবলমাত্র ঈশোপনিষৎ বেদের "সংহিতার" অংশ।

ঈশোপনিষৎ উপনিষদগুলির মধ্যে ভাবগৌরবে সর্বোৎকৃষ্ট ও অন্যতম ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। পদ্যে লিখিত উপনিষৎ সমূহের মধ্যে এই উপনিষদ্ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উপনিষদের মূলতত্ত্ব মাত্র ১৮টি মন্ত্রে ব্যাখ্যাত। এই মন্ত্র সকল মহর্ষি

দধীচি কর্তৃক অনুসৃত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই উপনিষৎ আপাত বিরুদ্ধ বিষয়ের সমন্বয় শিক্ষা দেয়, যেমন - ঈশ্বর ও জগৎ, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম ও অন্তরের স্বাধীনতা, এক ও বহু, সত্তা ও বিকাশ, নিষ্ক্রিয় ঐশ্বরিক অব্যক্তিত্ব ও সক্রিয় ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যা, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি, এবং পার্থিব জীবন ও অমরত্ব। কিন্তু কেহ কেহ বলেন জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না। কারণ আত্মজ্ঞান ও কর্মবিধি পরস্পর বিরোধী। ঈশ উপনিষদের মন্ত্রে আত্মার যথার্থ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাই এই জ্ঞানগর্ভ মন্ত্রসকল যজ্ঞাদিতে ব্যবহৃত হয় না এবং হতেও পারে না। সুতরাং "ঈশা বাস্যম্" ইত্যাদি মন্ত্রের কর্মাত্মক নির্দেশ করা যায় না। এই উপনিষদের সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেন যে যদি সমস্ত উপনিষদাবলী ও সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থাদি অকস্মাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায় কিন্তু যদি শুধুই এই "একটি মাত্র" মন্ত্র রক্ষা পায় তাহা হইলে এই একটি মন্ত্রের জন্যই হিন্দুধর্ম হিন্দুদের মনে চিরদিন সজীব হয়ে থাকবে।

আচার্য রাধাকৃষ্ণন বলেন যে সাংসারিক জীবন এবং ভগবানে অর্পিত জীবন যে পরস্পর বিরোধী নহে - ইহাই এই উপনিষদে শিক্ষা দেয়। স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে এই উপনিষদখানি ইংরাজী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন।

ঈশোপনিষদের "শান্তিপাঠ" মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম - পরব্রহ্ম জগদতীত এবং জগদ্ব্যাপী অনন্ত এবং ইন্দ্রিয় অতীত। এই বিশ্বও অনন্ত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-মনাদির গোচর প্রত্যক্ষ অনন্ত বিশ্ব - সেই অনন্ত নিরুপাধিক - নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম হইতে উদগত বা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তবুও এই জন্ম বা সৃষ্টির জন্য বা সৃষ্টির জন্য অব্যয়-অক্ষয় পরব্রহ্মের একত্বের কোনও পরিবর্তন হয় না। তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

এই উপনিষদের ১৮টি মন্ত্রের প্রথমটিতে ঈশ্বর জগৎ ও জীবের ব্যাখ্যায় ত্যাগের দ্বারা ভোগের কথা বলা হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যায় ইহা তত্ত্ব জ্ঞানের

উপদেশ ও সন্ন্যাসের বিধান “নিবৃত্তি মার্গের” কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম ও পার্থিব জীবনের সমর্থনে গৃহস্থের কর্তব্যের বিধান “প্রবৃত্তি মার্গে”র কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় মন্ত্রে অবিশ্বাসী ও অবিদ্বানদিগের নিন্দা করা হয়েছে। ৪র্থ হইতে ৮ম মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ বর্ণনায় “ব্রহ্মবিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত” বর্ণিত হয়েছে।

নবম থেকে একাদশ মন্ত্রে বিদ্যা (দেবতা জ্ঞান - ব্রহ্মজ্ঞান “কর্মবিহীন উপাসনা”) এবং অবিদ্যা (উপাসনাবিহীন কর্ম, বিদ্যারহিত ও জ্ঞান রহিত কর্ম) এতদুভয়ের ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনায় “কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান” উভয়ের একত্র প্রয়োজন বোঝান হয়েছে। এবং উভয়ের একত্র প্রয়োজনের গুরুত্ব আরোপের জন্য ৯ম মন্ত্রে কেবলমাত্র "অবিদ্যার" উপাসনা অথবা শুধুই “বিদ্যার” উপাসনার নিন্দা করা হয়েছে।

দশম মন্ত্রে বিদ্যার (দেবতা জ্ঞানের) ও অবিদ্যার (কর্মের উপাসনার) পৃথক পৃথক ফল স্বীকৃত হলেও একাদশ মন্ত্রে উভয়ের সমুচ্চয় বিধান করে অমৃতত্ব লাভের জন্য “বিদ্যা ও অবিদ্যা” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্মের উভয়ের একত্র সাধনা প্রয়োজন বলেছেন। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ মন্ত্রে “সম্ভূতি ও অসম্ভূতি” অর্থাৎ প্রকাশ (প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ) এবং অপ্রকাশ (অব্যাকৃতা প্রকৃতি) রাধাকৃষ্ণণ যাকে Manifest and Unmanifest বলেছেন - সেই উপাসনা সম্পর্কে বর্ণনায় ১২শ মন্ত্রে এই উভয়ের পৃথক পৃথক উপাসনার নিন্দা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ মন্ত্রে অসম্ভূতির এবং সম্ভূতির উপাসনার পৃথক পৃথক ফল স্বীকার করে পরবর্তী মন্ত্রে অর্থাৎ চতুর্দশ মন্ত্রে উভয়ের সমুচ্চয় বিধান করে সম্ভূতি ও অসম্ভূতি পরস্পরের প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে। ১৫শ থেকে ১৮শ মন্ত্রে পূর্বোল্লিখিত একাদশ মন্ত্রের অমৃতত্ত্ব লাভের “মার্গ” বর্ণনা এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দর্শনের জন্য এবং কৃতকর্মের অর্থাৎ উপাসনাদি কৃতকর্মের তাঁহা কর্তৃক যে স্মরণ তৎসহায়েই ইষ্টগতি লাভ হয়। সর্বশেষে আমাদিগের নিজ নিজ কর্মফলের শ্রেষ্ঠফল লাভের জন্য তিনি

আমাদিগকে সুপথে (শোভন পথে - উত্তর মার্গে বা দেবযানে) চালিত করে আনন্দ ও অমৃতত্ত্বে নিয়ে যান এই প্রার্থনা জানান হয়েছে। কারণ দক্ষিণ পথে গমন হলে পুনঃ জন্ম মরণ যাতনা ভোগ করতে হয়। তাই শোভন বা দেবযান পথে নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা - ইহাই শেষ প্রার্থনা। উপনিষদের ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতামত এবং মতান্তর বহু প্রাচীনকাল থেকেই আছে। আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা দ্বারা অথবা উপনিষদের ভাষ্য দ্বারা নিজ নিজ মতবাদ অনুযায়ী উপনিষৎ ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সকল দার্শনিকতত্ত্বের সকল কথা সঠিক বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। মোটকথা উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা। সুতরাং ব্রহ্মই তাহার মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় – নিত্য ও অনিত্যের বিশ্লেষণ করাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। উপনিষদের কোনও অংশ ঋষিদিগের প্রতাক্ষ জ্ঞান এবং কোনও কোনও অংশ তাঁহাদের তৎকালীন জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর রচিত। এখানে আচার্যদিগের মত ও ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বহু পণ্ডিত গুণিজন করেছেন ও করছেন। ঐ সকল সুধীজনের ব্যাখ্যাত ভাষ্য টীকা ও অনুবাদ থেকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সাধ্যমত সঙ্কলন ও সঞ্চয়ন করলাম।

ঈশোপনিষদ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্বমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্যাখ্যা- ওঁ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝায় এবং তাঁহাকে উপাসনা করা হয়।
অদঃ-ঐ ইন্দ্রিয়াতীতলোক-নির্গুণ ব্রহ্ম-পরব্রহ্ম কারণাত্মক ব্রহ্ম।
ইদং-এই শব্দটি প্রত্যক্ষার্থবোধক সগুণ ব্রহ্ম - কার্যাত্ম ব্রহ্ম। অদঃ পূর্ণং - নির্গুণ পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী - কোনও কিছু দ্বারা খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ নহে।

ইদং পূর্ণং - নামরূপে অবস্থিত প্রকাশিত সোপাধিক সগুণ ব্রহ্ম এই প্রত্যক্ষ জগৎ ইহাও স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী।

অতএব এই উভয়ই পূর্ণ - পূর্ণাৎ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ কারণাত্মক পরব্রহ্ম হইতে। পূর্ণমুদচ্যতে অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ কার্যাত্মক ব্রহ্ম উদগত বা উৎপন্ন হন। অর্থাৎ পূর্ণ "অদঃ" হইতে পূর্ণ "ইদং" উৎপন্ন হন। কিন্তু ইদং এই উদ্‌গত বা উৎপন্ন হইবার সময় সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করিয়াই উদ্ভুত হন।

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদামায় - এই উদ্ভুত কার্য ব্রহ্মের - এই জগতের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলেও অর্থাৎ বিদ্যা সহায়ে অবিদ্যা (সেই কার্যব্রহ্মের নাম-রূপ প্রভৃতি উপাধি সমূহ) আদায় করিলে "পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" অর্থাৎ সেই কারণাত্মক পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহার ক্ষয়ও নাই বৃদ্ধিও নাই। তিনি অনন্ত-নিত্য-সর্বব্যাপী-অব্যয়-অক্ষয়।

গীতার ১৩/১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ তুলনাটি আছে। "সুবর্ণবলয়" যখন "সুবর্ণ" অবস্থা তখন সে নির্গুণ বা "পর"। কিন্তু সেই সুবর্ণ যখন বলয়ের আকার ধারণ করে তখন তাহা সত্তায় "সুবর্ণ" থাকিলেও আখ্যায় বলয় হইল। অর্থাৎ সগুণ বা "অপর" হইল। এই সুন্দর তুলনাটি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "উপনিষদ্" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল। সুবর্ণ "বলয়" বলিয়া অভিহিত হইল কখন? যখন সে নাম রূপ ধারণ করিল। যদি নাম ও রূপকে অবগত করা যায়, বা আদায় করা যায় তাহা হলে যা অবশেষ থাকে তা "সুবর্ণ" বলে অভিহিত হবে না কি?

সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম যখন ব্যবহারিক সত্তায় নাম ও রূপ দ্বারা অভিহিত হলেন তখন তাঁকে "ইদং" বা সগুণ ব্রহ্ম বলে অভিহিত করা হইল। ইহা সেই পূর্ণত্বেরই বিকার সুতরাং ইহা হইতে নাম ও রূপ নামক বিচার আদায় করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা "পূর্ণ"।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ পরমাত্মার প্রতীকে নিকটতম ও প্রিয়তম নাম। সেইজন্য বেদ অধ্যয়নের পূর্বে এবং পরে "ওঙ্কার" উচ্চারণ বিধেয়। আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক বিপদ রোগাদি), আধিদৈবিক (দৈব বিপদ - আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপদ যেমন বজ্রপতন-

জলপ্লাবন-ভূমিকম্প ইত্যাদি) এবং আধিভৌতিক যেমন হিংস্র প্রাণীগণ কর্তৃক আক্রমণ - হিংসাদি। এই ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তির জন্য তিনবার "শান্তি" শব্দ উচ্চারণ করা হয়।

হে ভগবান! হে ঈশ্বর! হে পরমাত্মা! তুমি ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি বিধান কর- এই প্রার্থনা করি।

আগরতলায় আরেকবার **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

এবারের গল্পের নাম 'আবার আগরতলা'ও হতে পারতো, কারণ ২০১২-র মার্চে ত্রিপুরার রাজধানীতে মাত্র চারদিন কাটালেও সেই সময়কার স্পাইসজেটের সময়জ্ঞান আর মন্টু দাসের 'ইনোভা'র কল্যাণে আগরতলার আশপাশ দেখায় কোন খামতি ছিলনা। বাদ ছিল একটাই- 'ঊনকোটি'। এবার কোহিমা, আইজলের সাথে ত্রিপুরাকে জুড়ে নেওয়ার প্রধান কারণটাই ছিল ঐ এক কম এক কোটির দেশ। তার সাথে যখন আগরতলারও একবার রিভিশন হওয়ার সুযোগ থাকছে তখন তো মন নাচবেই। নাচানাচি অবশ্য ৫ থেকে ১৩ই নভেম্বরের ট্যুরে অনেক বারই থমকে গেছে 'ইন্ডিগো'র খামখেয়ালিপনায়। ৬ বার আকাশে উড়েছি বটে, কিন্তু আকাশের চেয়ে অনেক বেশি সময় এয়ারপোর্টে বসিয়ে রেখে বিমান কোম্পানী ভ্রমণসূচীকে একেবারে নয়ছয় করে ছেড়েছে! সবচেয়ে বেশি ভুগেছি অবশ্য ত্রিপুরা রাজ্যে পা রাখতে গিয়ে। সাত তারিখের সাত সকালে আইজলের LENG PUI এয়ারপোর্ট থেকে এক্সপ্লোরার ট্যুরের ২১ জন কোথায় সকাল ফুরাবার আগেই কলকাতা ছুঁয়ে আগরতলা পৌঁছে যাব -তা নয়, LENG PUI থেকেই প্লেন উড়লো দুপুর ১২টা ৩০-এ। তারপরের গল্পটা আরো ভয়ঙ্কর। কলকাতা থেকে আগরতলার প্লেন উড়ছি

উড়বো করতে করতে বিকেল ৫.২৫-এ শেষ পর্যন্ত টেক-অফ করলেও তাতে ঠাঁই মিললো আমাদের গ্রুপের মাত্র ১৩ জনের। বাদ পড়া বাকি আটজনের মধ্যে ট্যুর ম্যানেজার স্বয়ং শিবনাথ থাকায় আমাদের অবস্থা তো একেবারে হালভাঙ্গা নৌকো। শেষপর্যন্ত অবশ্য আগরতলার এয়ারপোর্ট 'মহারাজা বীর বিক্রম'-এ তিনটে গাড়ি নিয়ে শিবানুচর দীপ্তানু হাজির থাকায় হোটেল 'রাজধানী'তে পৌঁছাতে কোন অসুবিধা হয়নি। তবে পরদিন সকালের ফ্লাইটে ম্যানেজার সহ বাকি আটজন হোটেলে আসার খবর পাওয়ার আগে পর্যন্ত উৎকণ্ঠা তো একটা ছিলই। সাতের দিনটা তালেগোলে অম্বলে হয়ে যাওয়ায় ভ্রমণসূচীতে কিছুটা পরিবর্তন স্বাভাবিকই ছিল, ফলে বাকি আট। আগরতলায় পা রাখার আগেই যে আমাদের নগর পরিক্রমা শুরু হয়ে যাবে তাতেও কোন অস্বাভাবিকতা ছিলনা। তবে সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্টের পর যে পথ চলার শুরু হবে, আমরা কর্তা-গিন্নী যে তার তিন ঘন্টা আগেই ১০২ নম্বর ঘরের সুখশয্যা ছেড়ে রাজপথে নেমে আসবো এটা বোধহয় বাকিরা কেউ আশা করেনি। বিশাল রাজবাড়ি লেককে ঘিরে 'উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ', 'জগন্নাথ মন্দির', 'লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির' আর 'মা আনন্দময়ী আশ্রম' যেন ১৩ বছর আগের মরচে ধরা স্মৃতিতে একটা শান দিয়ে দিল। দিঘীর ধারের রাস্তা এখনও তেমনি সুন্দর। সুন্দরতর হয়েছে দু'ধারে দুই জলাশয় নিয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। ১৩ বছর আগে সংস্কারের কাজ চলছিল বলে প্রাসাদকে ভালো করে দেখতে না পারার যে আক্ষেপ ছিল, আজ সন্ধেবেলায় টিকিট কেটে ভিতরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের খেলা আর বাইরে থেকে সাতরঙের মেলা দেখে সে অতৃপ্তি মিটে গেছে।

লুচি-সব্জি, ব্রেড অমলেট অথবা চিকেন চাউমিন- যে যেমন চায় তাতে পেট ভরিয়ে চায়ে চুমুক দেওয়ার পরেই ১৩ জনের দলটা বেড়িয়ে পড়লাম ৫৬ কিলোমিটার দূরের উদয়পুরের দিকে – উদ্দেশ্য 'মাতাবাড়ি' তথা 'ত্রিপুরাসুন্দরী'র মন্দির। সুন্দর পরিষ্কার সাব্রমরোডের দু'পাশে মাঝে মাঝেই রবারের চাষ। হয়তো সেই কারণেই এখানকার গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থা মোটের ওপর মন্দ নয়। চলার পথের প্রথমে ডান দিকে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আর পরে বাঁয়ে ইকোপার্ক,

‘সিপাহীজলাকে’ পিছনে রেখে ঘন্টা দেড়েকে পৌঁছে সেলাম ৫১ সতী পীঠের অন্যতম ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে। পৌরাণিক মতে বিশ্বাসী ভক্তদের ধারণা এখানে দেবীর ডান পায়ের পাতা পড়েছিল। ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজা ধন্য মানিক্যের দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল কচ্ছপের মত দেখতে এক ছোট পাহাড়ের ওপর - যে কারণে এই শক্তিপীঠ আবার ‘কূর্মপীঠ’ নামেও পরিচিতি লাভ করেছে। গতবার প্রায় ভক্তশূন্য মন্দিরে পুরোহিতের খপ্পরে না পড়ে উপায় ছিলনা, এবার ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো। বিশাল লাইনে পুজো দেওয়ার ভিড়। সেখানে গা গলিয়ে সারাদিন বরবাদ করার বিলাসিতা স্থানীয় ভক্তদের থাকলেও আমাদের প্রয়োজন ছিল শুধু দেবী দর্শন। লাইন এড়িয়ে শুধুমাত্র দর্শনে তেমন সমস্যাও ছিলনা, সেটা মিটে যেতেই চলে আসি পাহাড়ের পায়ের তলায় ছড়িয়ে থাকা বিশাল দিঘী ‘কল্যাণ সাগরের’ পারে। কাজল কালো দিঘীর জলের মাঝখানে মানুষের তৈরী ফুটে থাকা পদ্ম চোখ টানলেও আসল আকর্ষণ ঘাটের কাছে বিশাল সব মাছ আর কচ্ছপের মেলা। মেলায় খেলা চলতে থাকলেও আমাদের দাঁড়াবার সময় তো নাই। তাই ছুটতে হলো ২১ কিলোমিটার পশ্চিমে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রুদ্রসাগরের মাঝখানে ‘নীরমহল’ দেখতে। বিশাল লেকের ভগ্নাংশ পেরিয়ে নীরমহলের খাস মহলে পৌঁছবার আসে পর্যটন দপ্তরের নৌকা ভাড়া করতে হয়। সেবার দু'জনের জন্য ১০০ টাকাই কাফি হলেও এবার ১৩ জনের জন্য মোটরচালিত বড় নৌকার ভাড়া দিতে হলো ২৫০০ টাকা। জলের গভীরতা বেশি না হলেও আয়তন প্রায় ৫.৫ বর্গ কিলোমিটার। তরতরিয়ে ভেসে যেতে যেতে নীরমহলকে ক্রমশঃ কাছে আসতে দেখাটাও বেশ রোমাঞ্চকর। ঘাটে নামার পর অন্দর মহলে যেতেও কিছু খরচা আছে। তার পরেই মহারাজা বীর বিক্রমের আমলের ছোঁয়া। প্রাসাদের ফাঁকা ঘরের জানলা দিয়ে রুদ্র সাগরের উঁকিঝুঁকি, বিশাল বাগান আর অন্দর মহলের ঘাট মনকে বর্তমান ভুলিয়ে নিয়ে চলে ১৯৩৯ সালের উৎসব মুখরিত দিনগুলোয়। ১৯৪৭ সালে মহারাজের মৃত্যুর পর যে জাঁক-জমক আর ছিল না বটে, তবু ভাঙ্গাচোরা জলসাঘরে যখন আমাদের মত পর্যটকদের কোমর দুলে ওঠে আর পা নাচতে থাকে নৃত্যের

তালে তালে - তখন শতাব্দী পিছিয়ে গিয়ে ভাঙ্গা ঘর ও যেন উৎসবের জোয়ারে ভাসতে থাকে।

নীরমহলের পর সিপাহীজলায় যদি কেউ বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখার মন নিয়ে যান তাহলে ঠিক আছে কিন্তু এখানকার চিড়িয়াখানাকে যদি আলিপুর জুলজিক্যাল গার্ডেনের সাথে তুলনা করতে হয় তবে হতাশ হতে হবে। বরং ভালো লাগবে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বর্ডারের কাছে কমলাসাগরের তীরে 'কসবা কালীবাড়ি'। এখানকার দেবীমূর্তিও ঠিক আমরা যেমনটা দেখতে অভ্যস্ত, তেমনটা নয়। মোটামুটি পাঁচফুট উচ্চতার এই পাথরের সিংহবাহিনী দশভুজা দেবীর পায়ের নীচে ছিন্ন শির অসুর। সেই অসুরের দু'পায়ের মাঝখানে আবার পাথরের শিবলিঙ্গ! উল্টোদিকেই কমলা সাগরের ওপারে কাঁটা তারের বেড়ার এক নিঃশব্দ অথচ দুরন্ত আহ্বান। ওপারের মানুষগুলো এত কাছে তবু কত দূরে! রয়েছে সজাগ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সা। যেন বলতে চায় - ব্যাস, এই পর্যন্ত। আর এগোনো যাবেনা। অমৃতসরের সীমান্তে আট্টারি-ওয়াঘা চেকপোস্টে ভারত-পাকিস্তান সেনা দ্বারা সূর্যাস্তে ফ্ল্যাগ ডাউনের বৈচিত্র্য উপভোগ করেনি এমন ভ্রমণপিপাসু নেই বললেই চলে, কিন্তু সেন্ট্রাল আগরতলা থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে আগরতলা-আখাউরা (AKHAURA) চেকপোস্টেও যে সকাল সন্ধ্যায় এমন আসর বসে সেটা ১৩ বছর আগে অন্ততঃ আমাদের জানা ছিলনা। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই দেশের প্রতিযোগিতামূলক প্যারেড ছিল আক্ষরিক অর্থেই জমজমাট। সেই মজাতে মজলেও আজকের শেষ পর্ব উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোতে হাজিরা দিতে আমাদের অসুবিধা হয়নি।

পরদিন ঊনকোটি। বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা কৈলাসহর হয়ে পথের দূরত্ব প্রায় ১৮৬ কিলোমিটার। রাস্তা যতই সুন্দর হোক অথবা স্থানীয় ড্রাইভারেরা যতই 'অলি গলি চলি রাম' করে দূরত্বকে কিছুটা কমাবার চেষ্টা করুক, যাতায়াত আর

পাহাড় চূড়ায় শিলামূর্তি সমেত ঊনকোটি পাহাড় দেখতে কমপক্ষে বারো ঘণ্টার ধাক্কা। ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্টকে একঘন্টা এগিয়ে দিয়ে সাত সকালে বেরিয়ে পড়ার হুইপ জারি করতে ট্যুর ম্যানেজারও বাকি দল নিয়ে আমাদের সাথে মিলে গেছিল তাই রক্ষে। না হলে পুরো ২১ জনের দলটাকে তিনটে ইনোভায় ভাগ করে চালাও পানসি বলার হিম্মত ছিল কার? বেড়াতে বেরিয়েও বিছানা না ছাড়তে চাওয়া দু' একজন লোক কোন ট্যুরে না থাকে!

ঊনকোটিকে বলা হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের আঙ্কর ভাট। অরণ্যময় এখানকার পাহাড়ে এক কম এককোটি হিন্দু দেবতার শিলামূর্তি রয়েছে বলে কিংবদন্তী! আগে তেমন প্রচার না পেলেও সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীতে তৈরী এই অসাধারণ ভাস্কর্য ২০২২ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী তালিকায় স্থান পাওয়ার পর পর্য্যটকের ভিড় এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে।

ঊনকোটি নাম হওয়ার পিছনে দুটো কারণ জানতে পেরেছি। একটি মতে কালু কামার নামে এক শিবভক্ত নাকি স্বয়ং শিবের সাথে কৈলাস যাওয়ার বায়না ধরেছিলেন। শিব শর্ত দিয়েছিলেন রাতারাতি এক কোটি দেবতার মূর্তি গড়ার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কালু কামার শর্ত রক্ষা করতে পারেননি। একটি মূর্তি বাকি থাকতেই রাত শেষ হয়ে যায়। ভক্তের ইচ্ছা পূরণ না হলেও শিবের বরে স্থানটির নাম হয় ঊনকোটি। বিখ্যাত হয়ে যায় ভক্ত কালু কামারের নাম। দ্বিতীয় মতটি একটু আলাদা। শিব মোট এককোটি দেবতা সহ ত্রিপুরার ওপর দিয়ে বারাণসী যাওয়ার পথে রাতে রঘুনন্দন পাহাড়ে বিশ্রাম নেন। শিব ছাড়া বাকি দেবতারা পথশ্রমে এতই ক্লান্ত ছিলেন যে রাত পোহালেও তাদের ঘুম ভাঙেনি। বিরক্ত মহাদেব একাই বারাণসী চলে যান আর বাকি দেবতারা অনন্তকালের জন্য পাথরের মূর্তিতে পরিণত হন।

অরণ্যময় শৈব তীর্থ ঊনকোটির পুরো পাহাড়টাই ভাস্কর্যময়। এর মধ্যে ‘গণেশ কুণ্ড’ সহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতের বৃহত্তম বাস রিলিফ ভাস্কর্যের ৩০ ফুট মুখ মণ্ডলের বিশালাকার কালভৈরব-বাসুদেব, রাম-লক্ষ্মণ, হনুমান আর গণপতি

মূর্তি। এছাড়াও মূর্তি রয়েছে হর-গৌরী, সিংহবাহিনী দুর্গা, পঞ্চমুখী শিব এবং বিষ্ণুপদের। অনুপম ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখেছি তিন মিটার দীর্ঘ শিবের নিখুঁত জটার মধ্যে। আর রয়েছে পাহাড় থেকে নেমে আসা বেগবতী ঝোরা। ঝরণার জলে সৃষ্টি হয়েছে শিব-সতী ও ব্রহ্মার নামে তিন কুণ্ড। পুণ্যার্থীরা পুণ্য কুড়িয়ে নিচ্ছে কুণ্ডের জলে স্নান করে, আর আমরা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করতে বেছে নিয়েছি অপরূপ ক্রমোচ্চ প্রাকৃতিক পথ, যে পথ আমাদের নিয়ে যাবে ঊনকোটির উচ্চতম শিখরে, যেখান থেকে হাত বাড়ালেই আকাশ!

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে লেখক

রাজ প্রাসাদ

নীর মহলের জলে

লেকের ধারে প্রাসাদ

রাজ প্রাসাদ

লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির

আগরতলা আখাউড়া বর্ডার

পিতা-মাতার স্নেহ **বাণীপ্রভা**

পিতা-মাতার স্নেহ যে কি
যে পেয়েছে সেই জানে
পায়নি যে জন বলবে সে কি
তার জীবনের অন্য মানে।
ছোট থেকে বড় হয় শিশু
এই স্নেহ ভালোবাসাতেই
পিতা মাতার প্রাণ ঢেলে দেয়
বিনা কিছুর আশাতেই।
পিতার স্নেহ মর্যাদায় ঘেরা
পুষ্করিণী যেমন
মায়ের স্নেহ অঝোর ধারা
ঝরণা ঝরায় যেমন।
পিতার স্নেহ শক্তি দেয়
সংসারে দাঁড়াতে
মায়ের স্নেহ শিখিয়ে দেয়
পা টা আগে বাড়াতে।
পিতা মাতার স্নেহ প্রেমেই
সন্তান হয় সম্পূর্ণ
এর অভাবে হোক না বড়
থাকে কিছু অপূর্ণ।
তাই তো বলি হে বিধাতা
পৃথিবীতে পাঠাও যাকে
পিতা মাতার স্নেহ যেন
ঘিরে থাকে সদাই তাকে।

সুমিতের জন্য **সুনন্দন ঘোষ**

নীল জিনসের প্যান্ট, বুক খোলা সাদা সার্ট,
একমুখ দাড়ি, একমাথা চুল –
আমি বলতাম রাগী যুবক।
অথচ হাসিটা ছিল শিশুর মতো।
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর্মজীবন –
লম্বা চড়াই ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখনো কাছে আসা,
কখনো আবছা হয়ে যাওয়া -----

তিন দশক পেরিয়ে আবার জড়ো হয়েছিল শাপলার দাম।
কলকাতার বুকে পাহাড় নিয়ে ছবির মেলা,
ছবিকে ঘিরে মিলনমেলা।
ভেবেছিলাম স্মৃতিতে পড়েছে মরচের দাগ।
ভুল !!
অতীতের দাঁড় বেয়ে সকলেই অনায়াসে ফিরে গেলাম
অনন্ত মাধুর্য্যে ---
সুখের আবেশকে মন্থন করে
যাদবপুরের দিনগুলোয়।
সেই পিছন থেকে জড়িয়ে ধরা,
সেই ছোঁয়া, সেই হাসি, সেই উষ্ণতা।
আলগা হয়ে যাওয়া মুঠো শক্ত করে ধরা -

ভালোবাসার মুহূর্তেরা কখন হারিয়ে যাবে
অনন্ত কুয়াশায়।

চিত্রগুপ্তের নোটিশ এসে গেছে
চুলে, দাঁতে, রক্তে, হৃদয়ে ।
এখন প্রতীক্ষা পুনর্মিলনের।
দিকচক্রবালে ছায়াশরীরে অপেক্ষা করছে
না বলে চলে যাওয়া বন্ধুর দল।
অশ্রু নয়,
প্রস্তুতি এখন
মৃত্যুর মাইলস্টোন পেরিয়ে যাওয়ার।
নতুন শরীর নিয়ে নতুন পাহাড়ী পথে
আবার শুরু হবে একসাথে পথচলা ।।